OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 107
Website: https://tirj.org.in, Page No. 951 - 958
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 951 - 958
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সহমরণ প্রথা ও নিবর্তক রামমোহন

ড. সুব্রত পাল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মুন্সী প্রেমচাঁদ মহাবিদ্যালয়
Email ID : spaul.dta91@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Widow, Conservative, Argument, Superstition, Promoter, Preventor, Celibacy, Forbidden.

Abstract
In the first half of the nineteenth century, one of the most pervasive social maladies afflicting Bengali society was the practice of sati (ritual widow immolation). Following their husbands' deaths, widows often resorted to self-immolation to escape the future suffering of widowhood and protect themselves from the predatory gaze of men. This voluntary death elevated the widow to the status of a goddess, thereby solidifying the practice of sati as a cultural ideal in India. The practice assumed several forms, including sahamarana (self-immolation), anumaran (consensual death), and sahasamadhi (joint burial). However, not all widows voluntarily chose sati. In many cases, the practice was imposed upon them to relieve families of the perceived burden of the widow or to allow relatives to claim her property. Some were coerced through force or drugging. While many widows went willingly, it remains indisputable that the practice was profoundly inhumane. Yet, to the conservative Hindu society, it was often dismissed as a trivial matter. Against this backdrop of social crisis, Raja Rammohan Roy emerged in the early nineteenth century with a mission to eradicate the practice. In his efforts, he sought to shape public opinion and draw attention to the issue among both Indian reformers and the British administration through three meticulously argued essays: 'Sahamaran Bisay Prabarttak O Nibarttaker sambad' (1818), 'Sahamaran Bisaye Prabarttak O Nibarttaker Dbitiya sambad' (1819) and 'Sahamaran Bisay' (1829). To demonstrate the non-scriptural nature of sati, Rammohan Roy cited authoritative texts from Hindu scriptures, eliminating any scope for superstition or myth. Drawing from the Manusmriti, he argued that widow immolation or anumaran was neither obligatory nor central to Hindu dharma, emphasising the scriptural preference for brahmacharya (celibacy). He categorically denounced the forced immolation of widows as 'premeditated murder of women'. His advocacy sought to awaken compassion, kindness, and love in the hearts of conservative Hindus. However, despite his staunch opposition to sati, Rammohan Roy did not explicitly propose a method for its abolition. The arrival of Lord William Bentinck as Governor-General in 1828 marked a turning point. Deeply disturbed by the plight of women, Bentinck expressed keen interest in eradicating the barbaric practice of sati.

Ultimately, on December 4, 1829, he formally outlawed the practice through legislation. In conclusion, while the legislative abolition of sati was a significant milestone under Bentinck, the credit for galvanising public opinion, supporting the law's implementation, and ensuring its enforcement rightly belongs to Raja Rammohan Roy.

Discussion

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি সমাজ যে সামাজিক ব্যাধির দ্বারা সর্বাধিক আক্রান্ত হয়েছিল, তা সহমরণ প্রথা। সুপ্রাচীনকাল থেকেই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর জীবন বিসর্জনের মর্মান্তিক প্রথা প্রচলিত ছিল, যা সতীপ্রথা নামে পরিচিত। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এই সতীপ্রথার অসংখ্য নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের 'কুমারসম্ভব', শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', এমনকি বাৎসায়নের 'কামশাস্ত্রে'ও এর উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন এই সতীপ্রথার মূলে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি চূড়ান্ত অবহেলা। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধীন, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা মূল্যহীন। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারী ভবিষ্যৎ যন্ত্রণা ও পুরুষের কামুক দৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সহমরণের পথেই আশ্রয় নিয়েছিল। বিধবা নারীর এই স্বেচ্ছামৃত্যু তাকে দেবীর আসনে বসাতো, ফলে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে সতী সংস্কার প্রভাব বিস্তার করে। এই সতীপ্রথার আবার বিভিন্ন রূপ বর্তমান— মৃত স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় স্ত্রী যদি পুড়ে মারা যায় তবে তা সহমরণ, মৃত স্বামীর ব্যবহৃত জিনিসপত্র নিয়ে ভিন্ন চিতায় পুড়ে মারা গেলে তা অনুমরণ, আবার মৃত স্বামীর সঙ্গে জীবিত স্ত্রীকে সমাধিস্থ করা হলে তাকে সহসমাধি বলা হয় (ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের যোগী সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল)। তবে এই সতীপ্রথা প্রাচীন যুগে শুধুমাত্র রাজপরিবারে বা অভিজাত সম্প্রদায়েই প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে তা সমগ্র ভারতীয় সমাজে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। বাঙালি সমাজে সতীপ্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত হয়ে ওঠে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও মঙ্গলকাব্যগুলির পাতায় এর নিদর্শন বিরল নয়। বিধবা মাত্রই সর্বদা স্বেচ্ছায় সহমরণে যেত তা নয়, বোঝা স্বরূপ বিধবা নারীর দায়ভাগ থেকে মুক্তির কারণে, এমনকি তার সম্পত্তির অংশ ভোগ করার জন্য নিকট আত্মীয়রা জোরপূর্বক বা মাদক দ্রব্য প্রয়োগ দ্বারা তাদের সতী হতে বাধ্য করত। এছাড়াও একদিকে নারীদের সতী হবার প্ররোচনা ও উৎসাহ দান করে ব্রাহ্মণেরা যেমন লাভবান হতেন অন্যদিকে তেমনি বৃদ্ধ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে সতী হবার নির্দেশ ও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা তাদের বাধ্য করত স্বামীর চিতায় জীবন বিসর্জন দিতে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েরা স্বেচ্ছায় সতী হলেও একথা স্বীকার্য যে, এ প্রথা ছিল সম্পূর্ণরূপে অমানবিক। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের চোখে এ ছিল নিছক ঠাট্টা-তামাশার বিষয়।

তবে সুদীর্ঘকাল ধরেই এই প্রথার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে অনুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে। মেধাতিথি, বাণভট্ট এমনকি শ্রীচৈতন্যদেবও এই সতীপ্রথাকে স্বীকার করতে পারেননি। মুঘল সম্রাটেরাই প্রথম এই প্রথার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আকবর, জাহাঙ্গীর ও ঔরঙ্গজেব এই অমানবিক প্রথাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলেও সার্থক হতে পারেননি। যার ফলশ্রুতি হিসেবে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষেও এই প্রথা পূর্ণ গৌরবে বর্তমান ছিল। স্বপন বসু তাঁর 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন—

> "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাংলাদেশে (বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায়) সতীপ্রথা খুব বৃদ্ধি পায়।"[১]

ব্রিটিশ সরকার এই অমানুষিক প্রথাকে মেনে নিতে না পারলেও এর বিরুদ্ধে সরাসরি কোনোরকম হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন, কারণ ভারতীয় ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক আচার-আচরণে বাধা দিলে এদেশীয়রা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তবে খ্রিষ্টান মিশনারিগণ, উইলিয়ম কেরী ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কিছু কিছু সচেতন কর্মচারীরাও এই প্রথা বন্ধের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার নিজামত আদালতের অভিমতের ভিত্তিতে জানিয়েছিলেন, সহমরণ হিন্দু শাস্ত্রসম্মত, তবে তা পালন করা সম্পূর্ণরূপে বিধবার ইচ্ছাধীন। বিধবাদের জোরপূর্বক বা মাদক প্রয়োগ করে সতী হতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 107
Website: https://tirj.org.in, Page No. 951 - 958
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাধ্য করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু সরকারের এই আপোষমূলক বিধিনিষেধগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং সরকারি পর্যায়ে মান্যতার কারণে সহমরণ প্রথার গুরুত্ব অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবার লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড হেস্টিংস, লর্ড আমহার্স্ট প্রমুখ ব্রিটিশ কর্মকর্তাগণ এই প্রথার কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়েও রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষের আশঙ্কায় এই প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে পারেননি।

এইরকম সামাজিক সংকটময় পরিস্থিতিতে সহমরণ প্রথার উচ্ছেদ সাধনের লক্ষ নিয়ে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আবির্ভাব ঘটে রাজা রামমোহন রায়ের। তিনি ধর্মীয় সংস্কার ও প্রাচীন ঐতিহ্যের বেড়া ভেঙে নতুন চিন্তা ও নতুন আদর্শ প্রচারের মধ্য দিয়ে যুক্তিবাদ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করেন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। রামমোহনই সর্বপ্রথম ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত বিষয় আলোচনার মাধ্যম হিসেবে আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য ধারার সূত্রপাত করেন। এ প্রসঙ্গে ড. অধীর দে তাঁর 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন—

> "ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ ও বাদানুবাদের মধ্য দিয়া রামমোহন আধুনিক বাংলা প্রবন্ধের প্রথম বুনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়াছেন।"[২]

রামমোহন সহমরণ নামক সামাজিক কুপ্রথার বিরোধিতা করে সমাজ সম্পর্কিত সুগভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সহমরণ প্রথার বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি জনমত গড়ে তোলার পাশাপাশি দেশীয় ব্যক্তিবর্গ ও ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য শাণিত যুক্তি ও প্রমাণ সমন্বিত তিনখানি বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন— ১. 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮), ২. 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯) ও ৩. 'সহমরণ বিষয়' (১৮২৯)। সহমরণ প্রথার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করার জন্য রামমোহন বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে যথোপযুক্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে কুসংস্কার বা কল্পনার কোনো স্থান নেই। ড. অধীর দে মন্তব্য করেছেন—

> "স্ত্রী জাতির প্রতি গভীর সহানুভূতি, তাহাদের সামাজিক অধিকার সম্পর্কে অপরিসীম আগ্রহ এবং সর্বোপরি উদার মানবিক বোধের পরিচয় রামমোহনের সামাজিক সংস্কারমূলক প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।"[৩]

রামমোহন 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ'-এ (১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষার্ধে প্রকাশিত) প্রবর্তক ও নিবর্তক নামে দুটি প্রতিপক্ষ নির্মাণ করে তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে আপন বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছেন। এখানে 'প্রবর্তক' হলেন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিরা অর্থাৎ সহমরণ প্রথার পক্ষপাতীরা। অপরপক্ষে 'নিবর্তক' হলেন সহমরণ প্রথার ঘোরতর বিরোধী অর্থাৎ স্বয়ং রামমোহন, যিনি সহমরণ প্রথার কবল থেকে নারী সমাজকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। রামমোহন নানা হিন্দুশাস্ত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সহমরণ বা অনুমরণ কোনো আবশ্যিক ব্যাপার নয়। প্রবর্তক বা সনাতন ধর্মাবলম্বীরা অঙ্গিরা, হারীত, বিষ্ণু, ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতি স্মৃতিসংহিতা থেকে বচন উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, সহমরণ বা অনুমরণ শাস্ত্রসম্মত। এ প্রসঙ্গে প্রবর্তক অঙ্গিরার উক্তি তুলে ধরে বলেছেন—

> "স্বামী মরিলে পর যে স্ত্রী ঐ পতির জ্বলন্ত চিতাতে আরোহন করে সে অরুন্ধতী সে বশিষ্ঠের পত্নী তাঁহার সমান হইয়া স্বর্গে যায়।"[৪]

এছাড়াও মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণের ফলে স্ত্রী মাতৃকুল, পিতৃকুল ও স্বামীকুল— এই তিন কুলকেই পবিত্র করে এবং স্বামীকে সমস্তরকম পাপকর্ম থেকে মুক্ত করেন। আবার অনুমরণ বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণে বলা হয়েছে—

> "অন্যদেশস্থ পতির মৃত্যু হইলে পর সাধ্বী স্ত্রী স্নান আচমনপূর্ব্বক পতির পাদুকাদ্বয়কে বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবেক।"[৫]

অন্যদিকে নিবর্তক অর্থাৎ রামমোহন বলেছেন যে, মনুর শাস্ত্র অর্থাৎ 'মনুসংহিতা'কেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা উচিত। 'মনুসংহিতা'য় বলা হয়েছে—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 107
Website: https://tirj.org.in, Page No. 951 - 958
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "পতির মৃত্যু হইলে পবিত্র যে পুষ্প মূল ফল তাহার ভোজনের দ্বারা শরীরকে কৃশ করিবেন এবং অন্য পুরুষের নামও করিবেন না। আর আহারাদি বিষয়ে নিয়মযুক্ত হইয়া এক পতি যাহাদের অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রী তাঁহাদের যে ধর্ম্ম তাহার আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানপূর্বক থাকিবেন।"[৬]

এতএব মনুর শাস্ত্রানুসারে রামমোহন বিধবাদের সহমরণ বা অনুমরণকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে ব্রহ্মচর্যকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই বিধবাদের স্বামীদেহের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে শাস্ত্র উপেক্ষা করে বলপূর্বক চিতায় তুলে দেওয়াকে রামমোহন 'জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীহত্যা' বলেই উল্লেখ করেছেন। প্রবর্তকের যুক্তি, বিধবা নারী ব্রহ্মচর্য জীবনযাপন করলে ব্যভিচার হবার সম্ভাবনা থাকে বলেই মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকেও পুড়িয়ে মারার পরম্পরা বা দেশাচার দীর্ঘদিন থেকেই চলে এসেছে। উত্তরে নিবর্তকরূপী রামমোহন জানিয়েছেন, কেবলমাত্র ভবিষ্যৎ ব্যভিচার সম্ভাবনাকে দূর করার জন্য ঈশ্বরভয়, শাস্ত্রভয় ও ধর্মভয়কে উপেক্ষা করে দেশাচার ও লোকনিন্দার ভয়ে অন্যায়ভাবে নারীহত্যা মহাপাপ এবং তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে, স্বামী বর্তমান থাকাতেও অনেক স্ত্রী ভ্রষ্টা হয়। রামমোহন বলেছেন, অন্যায়ভাবে স্ত্রীহত্যা করা এবং তাদের মরণকালীন কাতরতাতে প্রবর্তকের বিন্দুমাত্র দয়াবোধ জাগ্রত হয় না, যেমন—

> "শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগমহিষাদি হনন পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগমহিষাদির বধকালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না কিন্তু বৈষ্ণবদের অত্যন্ত দয়া হয়।"[৭]

শেষপর্যন্ত এই বিতর্কে প্রবর্তক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছেন এবং নিবর্তকের মতকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে রাজি হয়েছেন।

প্রবন্ধটি প্রচারিত হবার পর সহমরণ বিরোধী জনমত গড়ে ওঠার পাশাপাশি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের কাছে আক্রমণের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন রাজা রামমোহন রায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সহমরণের পক্ষে এবং রামমোহনের বিপক্ষে আক্রমণের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল সমাজের মূল অস্ত্র ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা'। রামমোহনের 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' প্রবন্ধটির প্রত্যুত্তরে কালাচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' রচনা করেন। এখানে তিনি বলেছেন—

> "পতি মরিলে সাধ্বী স্ত্রীর অগ্নি প্রবেশ ব্যতিরেকে আর এমন ধর্ম্ম নাই।"[৮]

এছাড়াও প্রবন্ধের সমাপ্তিতে লিখেছেন—

> "এই বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদের মধ্যে যে মুণ্ডকশ্রুতি প্রভৃতি আছে তাহা শূদ্রাদির পাঠ্য নয় এবং শ্রোতব্য নয়।"[৯]

যা তাঁর চূড়ান্ত রক্ষণশীল মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

রামমোহন রায়ও কাশীনাথের 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ'-এর একটি প্রত্যুত্তর রচনা করেন, যা 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' নামে ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "এই দ্বিতীয় পুস্তিকা অধিকতর ব্যাপক মানবিক মূল্যবোধ এবং যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটিতে শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্ক প্রাধান্য পেয়েছিল, কিন্তু 'দ্বিতীয় সম্বাদে' শাস্ত্র বিচারের অতিরিক্ত আছে নারীর দুঃখবেদনার সহৃদয় উপলব্ধি।"[১০]

কাশীনাথ তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন সহমরণ স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম এবং তা দেশাচারসিদ্ধ। উত্তরে নিবর্তক অর্থাৎ রামমোহন বলেছেন—

> "স্ত্রীবধ, ব্রহ্মবধ, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা ইত্যাদি দারুণ পাতক সকল দেশাচারবলেতে ধর্ম্মরূপে গণ্য হইতে পারে না। বরঞ্চ এরূপ আচার যে দেশে হয়, সে দেশই পতিত হয়।"[১১]

প্রবর্তক বিধবাদের বলপূর্বক দাহ করবার জন্য স্ত্রীলোকেদের চরিত্র সম্পর্কে অন্যায়ভাবে দোষারোপ করেছেন—

> "স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা এবং ধর্ম্মজ্ঞানশূন্যা হয়।"[১২]

প্রত্যুত্তরে রামমোহন যুক্তিসম্মতভাবে নারীজাতির বিরুদ্ধে এইসব মিথ্যা দোষারোপ খণ্ডন করে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। নারীজাতি দৈহিক শক্তিতে দুর্বল বলে পুরুষেরা তাদের সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত করে রাখেন। প্রথমত, নারীজাতিকে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়েছে, এখানে রামমোহনের প্রশ্ন হল—

> "স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন?"[১৩]

বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানচর্চার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হলে তারা যদি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বলা যায় কিন্তু তাদের শিক্ষার তো কোনো ব্যবস্থাই করা হয়নি। তাই নারী জাতিকে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বলা অযৌক্তিক। উপরন্তু বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতে লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাস পত্নী, যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ী প্রমুখ নারীরা সর্বশাস্ত্রজ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, নারীকে অস্থিরমতি বলেছেন সহমরণের পক্ষপাতীরা। এ প্রসঙ্গে রামমোহন বলেছেন—

> "যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্যে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়।"[১৪]

তাই নারীরা অস্থিরমতি, এই যুক্তি ভিত্তিহীন। তৃতীয়ত, নারীকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নারীজাতি সরল বিশ্বাসী, পুরুষের মতো স্বার্থপর নয়। বিশ্বাসঘাতকতার দোষ নারী নয় পুরুষের চরিত্রে অধিক বর্তমান। সে বিষয়ে রামমোহনের বক্তব্য স্মরণযোগ্য—

> "প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশ গুণ অধিক হইবেক।"[১৫]

চতুর্থত, নারীকে যে সানুরাগা বলা হয়েছে, তা নারী-পুরুষের বিবাহ ব্যবস্থার বৈষম্যের মধ্যেই ব্যক্ত হয়েছে। কারণ একটি পুরুষের পাঁচ- দশটি স্ত্রী দেখা যেত কিন্তু নারীর একটিই স্বামী এবং সে স্বামী মারা গেলে বিধবা স্ত্রী সমস্ত সুখ ত্যাগ করে সহমরণ বা ব্রহ্মচর্য জীবনযাপন করত। পঞ্চমত, নারী ধর্মভয়হীন, এ সিদ্ধান্ত অমূলক। কুলীন ব্রাহ্মণদের অসংখ্য পত্নীদের ধর্মভয় এবং স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বর্তমান ছিল বলেই তারা বিনা বাক্যব্যয়ে শত দুঃখ, অপমান ও যন্ত্রণা সহ্য করত। বিবাহের সময় ব্রাহ্মণেরা স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গ রূপে স্বীকার করলেও ব্যবহার করতেন পশুর মতো। রামমোহন জানিয়েছেন, স্বামীর থেকে নারীরা কোনো রকমের ভদ্র আচরণ আশা করতে পারত না অপরদিকে নারীরা স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি নিষ্ঠা আজীবন রক্ষা করে চলতেন। তাই আমরা বলতে পারি, নারী প্রকৃতপক্ষেই ধর্মনিষ্ঠ।

প্রবন্ধের শেষে দেখা যায়, রামমোহন আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তরে দয়ামায়া, স্নেহ, প্রেম জাগ্রত করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর শেষ আবেদন হৃদয়ের কাছে—

> "দুঃখ এই, যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।"[১৬]

রামমোহনের সহমরণ বিষয়ক সর্বশেষ প্রবন্ধটি 'দ্বিতীয় সম্বাদ'-এর দীর্ঘ দশ বছর পর 'সহমরণ বিষয়' (১৮২৯) নামে প্রকাশিত হয়। রামমোহন তাঁর প্রথম দুটি প্রবন্ধে সহমরণ প্রথার দুর্বলতা তুলে ধরে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের শ্রদ্ধার মনোভাবে আঘাত করেন। ফলে বিরোধীরা তাঁকে তীব্র আক্রমণ করতে শুরু করেন। এই রকমই সহমরণ প্রথার পক্ষপাতী দু'জন ব্যক্তি 'বিপ্রনামা' ও 'মুগ্ধবোধছাত্র' এই ছদ্মনামে রামমোহনকে তীব্র আক্রমণ করে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় দুটি পত্র

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 107
Website: https://tirj.org.in, Page No. 951 - 958
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রকাশ করেন। রামমোহন এই দুটি পত্রের উত্তরে রচনা করেন ‘সহমরণ বিষয়’ নামক প্রবন্ধটি। ‘বিপ্রনামা’ কাম্যকর্ম বিষয়ে গীতার বিধানকে অবলম্বন করে আটটি প্রশ্ন করেছিলেন এবং সে বিষয়ে রামমোহনের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। রামমোহন বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে প্রত্যেকটি প্রশ্নের যুক্তিসম্মত উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন— ধর্মকে বাণিজ্য হিসেবে দেখা মূঢ়ের কাজ, ফল কামনা করে কর্ম করা নরাধমের লক্ষণ, ভগবান সকাম কর্মের নিন্দা করে নিষ্কাম কর্মকেই উত্তম কর্ম বলেছেন, পরমেশ্বরের আরাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলেই কামনা-বাসনা থেকে মনুষ্য সমাজের মুক্তি ঘটবে, কর্মফলে মানুষের কোনো অধিকার নেই। সহমরণের ফল স্বর্গলাভ, এই বিষয়ে রামমোহন বলেছেন—

> “স্বর্গ কামনা করিয়া পরমায়ুঃ সত্ত্বে আয়ুর্ব্যয় করিবেক না অর্থাৎ মরিবেক না।”[১৭]

এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন কাম্যকর্ম ও নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে গীতায় অসংখ্য শ্লোক রয়েছে, কিন্তু অল্পবুদ্ধি 'বিপ্রনামা' সেগুলির তাৎপর্য উদ্ধারে ব্যর্থ হয়েছেন।

‘মুগ্ধবোধছাত্র’ নামে অপর ছদ্মবেশী ব্যক্তিও গীতায় উল্লিখিত কাম্যকর্ম ও নিষ্কাম কর্ম বিষয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে বলেছেন, ভগবান ও তাঁর অংশাবতার অর্জুন এবং তাঁর সমকালীন অনুগত ব্যক্তিরা যে সমস্ত কর্ম করেছেন সেই সমস্ত কর্মই কাম্যকর্ম এবং সেই অনুসারেই গীতার অর্থ করতে হবে। উত্তরে রামমোহন বলেছেন, ‘মুগ্ধবোধছাত্রে’র এরূপ ব্যবস্থার ফলে সমস্ত ধর্ম লোপ পাবে—

> “কি আশ্চর্য্য মুগ্ধবোধছাত্র ও তাঁহারদিগের অধ্যাপক কিঞ্চিৎ লাভার্থী হইয়া ধর্ম্ম লোপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।”[১৮]

আসলে প্রাচীন শাস্ত্রে এমন অনেক বিষয়ই আছে যা একালে কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সহমরণের পক্ষপাতী নিষ্ঠুর ও ছলগ্রাহী ‘মুগ্ধবোধছাত্র’ বিধবাদের সহমরণকে শাস্ত্রদ্বারা অনিষিদ্ধ ও উত্তম ধর্ম বলে মন্তব্য করেছেন। উত্তরে রামমোহন লিখেছেন, সহমরণরূপ কাম্যকর্মের নিন্দা ও নিষেধ গীতার অসংখ্য শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতে মাদ্রী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের সহমরণ বর্ণিত আছে বলে একালেও তার অনুসরণ সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। প্রবন্ধের শেষে রামমোহন ব্যঙ্গ করে ‘মুগ্ধবোধছাত্র’ সম্বন্ধে বলেছেন—

> “শাস্ত্রের অন্যথা করিয়া আপন কুমত রক্ষার নিমিত্ত তাবৎ বিধবাকে ধর্মত্যাগিনী কহিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, স্ত্রীবধরূপ অতিপাতকে প্রবর্ত্ত হইলে এইরূপ প্রবৃত্তিই ঘটিয়া থাকে।”[১৯]

রামমোহন ‘বিপ্রনামা’ ও ‘মুগ্ধবোধছাত্রে’র এই সমস্ত ভিত্তিহীন বক্তব্যের যুক্তি আশ্রয়ী ও শাস্ত্রসম্মত উত্তর দিয়েছেন, এর মূলে ছিল রক্ষণশীল সমাজের তীব্র বিরোধিতাকে নিরস্ত্র করবার প্রয়াস। তবে রামমোহন সহমরণ প্রথার ঘোরতর বিরোধী হলেও কীভাবে এই নিষ্ঠুর প্রথা নিবারিত হতে পারে সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন।

১৮২৮ সালে লর্ড আমহার্স্ট পদত্যাগ করলে এদেশে নতুন গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক। তিনি যথার্থই বিচক্ষণ পুরুষ ছিলেন, তাই নারীজাতির অসহায়তাকে মুখ বুজে সহ্য করতে পারেননি। তিনি নির্মম সহমরণ প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করার জন্য বিশেষ আগ্রহ অনুভব করেছিলেন। রামমোহনের ঘোরতর সহমরণ বিরোধিতা ও বেন্টিঙ্ক-এর সহমরণ প্রথা নিষিদ্ধ করার প্রয়াস রামমোহন পন্থীদের সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিরোধকে সুতীব্র করে তুলেছিল। উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এই প্রথাকে নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে রামমোহনের পরামর্শ আবশ্যক বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু রামমোহন সহমরণ প্রথাকে দূর করতে চাইলেও সরকারিভাবে আইন করে নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি নানারকম বিধিনিষেধ জারি করে ও শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে জাগ্রত করে কোনোরকম আলোড়ন ছাড়াই এই প্রথাকে নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সহমরণ প্রথাকে আইন করে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। সহমরণ প্রথাকে নিষিদ্ধ করা হলে রাজা রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধিরা ১৮৩০ সালে বেন্টিঙ্ক-এর কাছে প্রতিবাদ স্বরূপ ‘সতীদাহ আবেদন’ অর্পণ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে নানা আবেদন-নিবেদন ও অনুনয় করলেও বেন্টিঙ্ক নিজের সিদ্ধান্ত অটল ছিলেন। রামমোহন সহমরণ বিষয়ে

আইন প্রণয়নকে সমর্থন না করলেও একথা স্বীকার্য যে তিনিই প্রথম এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জনমত গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আসলে ব্রিটিশ শাসনে বিশ্বাসী রামমোহন মনে করেছিলেন, সহমরণ প্রথাকে আইন করে নিষিদ্ধ করা হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু রক্ষণশীলরা যখন সহমরণ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারলেন না তখন রামমোহনই প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন গভর্ণর জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানাতে এবং সহমরণ নিবারণ আইন যাতে বলবৎ থাকে সে বিষয়েও বিশেষ আগ্রহ অনুভব করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে স্বপন বসু তাঁর ‘বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস’ গ্রন্থে লিখেছেন—

> “সুস্পষ্টভাবে এ-বিষয়ক আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করার জন্য সহমরণ নিবারণের গৌরব রামমোহনের প্রাপ্য না হলেও, এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে সমাজকে নাড়া দেবার, আইন পাশ হলে প্রকাশ্যে তার সমর্থনে এগিয়ে আসার ও এই আইন যাতে বলবৎ থাকে তার জন্য উদ্যোগী হবার গৌরব অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য।”[২০]

রামমোহনের হাত ধরেই যুক্তিমূলক বাংলা মৌলিক প্রবন্ধ-সাহিত্য ধারার শুভসূচনা হলেও তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে যথার্থ সাহিত্যিক ও শিল্পগত দাবি পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। হৃদয়ের অনুভূতিকে উপেক্ষা করে যুক্তি-তর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি মূলত প্রয়োজনের তাগিদেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়কে অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, সে কারণেই সহজাত রসপ্রেরণা ও শিল্পচেতনা তাঁর সৃষ্টিকর্মে প্রকাশ পায়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ‘সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ’-এ আবেগের প্রাধান্য থাকলেও সাহিত্যরস যৎসামান্যই। তাই তাঁকে যথার্থ সাহিত্য-শিল্পীর মর্যাদা দেওয়া যায় না। ড. অধীর দে এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> “রামমোহনের রচনা বিচার বিশ্লেষণ করিয়া বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সাহিত্য শিল্পীর পরিবর্তে তাঁহাকে প্রকৃত বিতর্কমূলক প্রবন্ধ রচনার পথপ্রদর্শক বলিয়া অভিহিত করা যায়।”[২১]

প্রবন্ধের ভাষা অনেকাংশেই স্বচ্ছন্দ নয়, এ বিষয়ে প্রবন্ধগুলির রচনাকালকে মাথায় রাখতে হবে তবেই আমরা ভাষা-সংক্রান্ত ত্রুটিগুলিকে অতি সহজেই উপেক্ষা করতে পারব।

Reference:

১. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, কলকাতা-০৯, পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০০, পৃ. ১১৯
২. দে, অধীর, আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা (প্রথম খণ্ড), কলকাতা-০৭, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ২০
৩. তদেব, পৃ. ২৫
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পাদনা), রামমোহন গ্রন্থাবলী (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা-০৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৮০, পৃ. ৩
৫. তদেব, পৃ. ৪
৬. তদেব, পৃ. ৫
৭. তদেব, পৃ. ১১-১২
৮. তদেব, পৃ. ১৫
৯. তদেব, পৃ. ২৪
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা-৭৩, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১, পৃ. ১৪৮

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পাদনা), রামমোহন গ্রন্থাবলী (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা-০৬, তৃতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৮০, পৃ. ৩৯

১২. তদেব, পৃ. ৪৪

১৩. তদেব, পৃ. ৪৫

১৪. তদেব, পৃ. ৪৫

১৫. তদেব, পৃ. ৪৬

১৬. তদেব, পৃ. ৪৭

১৭. তদেব, পৃ. ৫৩

১৮. তদেব, পৃ. ৫৬

১৯. তদেব, পৃ. ৫৮

২০. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, কলকাতা-০৯, পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০০, পৃ.১২৯

২১. দে, অধীর, আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা (প্রথম খণ্ড), কলকাতা-০৭, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ২০